জীবনে যা দেখলাম

দ্বিতীয় খণ্ড (১৯৫২-১৯৬২)

[৯ খণ্ডে সমাপ্ত]

অধ্যাপক গোলাম আযম

কামিয়াব প্রকাশন - ঢাকা

সূচিপত্র

বৃহত্তর পারিবারিক বৈঠক/১৫
বৈঠকের আসল উদ্দেশ্য/১৫
মাওলানা কাযী গোলাম কবিরের বংশধর/১৬
২৮ ডিসেম্বরের জমায়েত/১৬
এক অঘটন ঘটে গেলো/১৭
জন্ম, মৃত্যু ও বিবাহবার্ষিকী/১৮
অনুষ্ঠানের উপসংহার/১৯
বেসরকারি কলেজ টিচার্স এসোসিয়েশনের প্রতিষ্ঠা সম্মেলন/২০
অন্তর্মুখী ও বহির্মুখী স্বভাব/২০
কলেজ টিচার্স এসোসিয়েশন গঠনে কর্মব্যস্ততা/২২
কলেজ শিক্ষক সম্মেলনের সুফল/২৩
ইসলামিক কালচারেল কনফারেন্স/২৫
গানটির আবেদন/২৬
ইসলামী নেতৃত্ব-সংকট/২৬
নেতৃত্ব সংকটের সমাধান/২৭
কার্জন হলের সম্মেলনের বিবরণ/২৮
হায়রে মৃত্যু/৩০
মৃত্যুই সবচাইতে বেশি নিশ্চিত/৩০
সাকুর মৃত্যুর প্রতিক্রিয়া/৩১
আমার ভাইটি সাথীহারা হয়ে গেলো/৩২
বৃদ্ধ বয়সে স্ত্রী হারানো/৩৩
প্রৌঢ় বয়সে বিয়ে/৩৪
সাকুর সুন্দর মৃত্যু/৩৪
তমদ্দুন মজলিসের ক্যাম্প/৩৬
দু'সংগঠন মিলে পূর্ণ ইসলাম/৩৬
ইসলামী অর্থনীতি সম্পর্কে সঠিক ধারণার অভাব/৩৭
তমদ্দুন মজলিসকে এখনো ভালোবাসি/৩৯
কুষ্টিয়া শহরে তমদ্দুন মজলিসের সম্মেলন ও জনসভা/৪১
তমদ্দুন মজলিসের সিলেট সম্মেলন/৪১
অধ্যক্ষ আবুল কাসেম/৪২
তমদ্দুন মজলিস আরো সক্রিয় হোক/৪৩
আমি কোনো রাজনৈতিক দলের সাথে জড়িত ছিলাম না/৪৩
কেন মুসলিম লীগ পছন্দ করলাম না/৪৪

লাহোরে এক সপ্তাহ/১১৫
গণ-পরিষদের পরিচয়/১১৭
নতুন সরকার গঠন/১১৭
আবার সরকার পরিবর্তন/১১৮
রাওলপিণ্ডি রওনা/১১৯
মারী রওনা/১১৯
মারীতে আমাদের তৎপরতা/১২০
মারীতে রাজনীতির চিত্র/১২২
মারী থেকে বিদায়/১২৩
রাওয়ালপিণ্ডিতে তিন দিন/১২৪
করাচীতে আমার কর্মতৎপরতা/১২৫
গণপরিষদের অধিবেশন শুরু হলো/১২৭
করাচীতে টীমের তৎপরতা/১২৭
লবীর বিচিত্র অভিজ্ঞতা/১২৮
একটি বিশেষ উপলব্ধি/১৩০
এ প্রয়োজন এতদিনে পূরণ হলো/১৩০
আল্লাহর আইন মানে কী/১৩১
রংপুর কলেজ থেকে অপ্রত্যাশিত চিঠি/১৩২
করাচীতে জামায়াতে ইসলামীর সম্মেলন/১৩৩
মাওলানা মওদূদীর সাথে দীর্ঘ একান্ত সাক্ষাৎ/১৩৪
আমার প্রথম প্রশ্ন/১৩৫
আমার দ্বিতীয় প্রশ্ন/১৩৭
আমার তৃতীয় প্রশ্ন/১৩৭
জামায়াতের সম্মেলনের দুটো অনুষ্ঠান/১৩৮
জামায়াতের রুকন সম্মেলন/১৩৯
করাচীতে অবস্থান/১৪০
জামায়াতের করাচী সম্মেলন উপলক্ষে মজলিসে শূরায় পূর্ব-পাকিস্তান সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ/১৪১
ঢাকা প্রত্যাবর্তন/১৪২
প্রথম প্রাদেশিক আমীর নির্বাচন/১৪৩
মাওলানা মওদূদীর ঢাকা আগমনের প্রস্তুতি/১৪৩
মাওলানার ঢাকা আগমন/১৪৪
মাওলানা মুহাম্মদ আকরাম খান/১৪৬
মাওলানা শামসুল হক ফরিদপুরী/১৪৬
পূর্ব-পাকিস্তানে মাওলানার একচিল্লা (৪০ দিন)/১৪৭
ঢাকায় মাওলানার অবস্থান/১৪৮

৪৯.

বৃহত্তর পারিবারিক বৈঠক

২৮ ডিসেম্বর (২০০১ সাল) আমার আব্বা মরহুম মাওলানা কাযী গোলাম কবিরের ছেলে, মেয়ে, বৌ-মা ও জামাতা, নাতি ও নাত-বৌ, নাতনী ও নাতনীদের স্বামী এবং তাদের সন্তানাদির এক জমায়েত হয়ে গেলো। খুব শর্ট নোটিশে হওয়ায় সবাই শরীক হতে পারেনি। যারা বিদেশে আছে তাদের মধ্যে আমার মেঝো বৌ-মা এবং তার দু'মেয়ে এক ছেলে বেড়াতে আসায় উপস্থিত ছিলো। যারা ঢাকার বাইরে তাদেরকে ডাকা হয়নি। এমনকি যারা ঢাকা মহানগরীতে থাকে তাদের সবাইকেও খবর দেওয়া যায়নি।

৮/১০ বছর আগে মাঝে মাঝে এ রকম বৈঠক করা হতো, তাদেরকে দীনের দিক দিয়ে অগ্রসর করা এবং পারস্পরিক খোঁজ-খবর নেবার জন্য। আমার আব্বার সন্তানদের মধ্যে আমি সবার বড় হিসেবে এ ব্যাপারে আমার দায়িত্বই বেশি বলে অনুভব করি। আব্বাও এ দায়িত্ব পালনের তাগিদ দিয়ে গেছেন। এ দায়িত্ব বিভিন্নভাবে পালন করলেও সবাইকে একত্র করে কোন অনুষ্ঠান এতোদিন করা হয়নি।

আমার চতুর্থ ছেলে মেজর আযমী ঈদুল ফিতরের ছুটি উপলক্ষে সপরিবারে বাড়িতে আসলো। সে-ই এ জমায়েতের প্রস্তাব করলো। আমি সম্মতি দিয়ে আমার বাড়িতেই এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করার দায়িত্ব তাকেই দিলাম।

বৈঠকের আসল উদ্দেশ্য

রাসূল (স) ইরশাদ করেছেন, "তোমরা প্রত্যেকেই রাখাল এবং তোমাদের অধীনস্থদের দায়িত্বশীল।" এ হাদীস অনুযায়ী আমরা যদি পরবর্তী বংশধরদেরকে আল্লাহর পথে অগ্রসর করার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা না করি, তাহলে আল্লাহর দরবারে দোষী সাব্যস্ত হবো। রাসূল (স) সুসংবাদ দিয়েছেন যে, যদি কেউ সন্তানদেরকে সৎকর্মশীল হিসেবে গড়তে পারে তাহলে তার মৃত্যুর পর সন্তানদের নেক আমলের সওয়াব তার আমলনামায়ও যোগ হতে থাকবে। দুনিয়া থেকে বিদায় নেবার পর আমার ছেলেরা যদি আল্লাহ তাআলার নিকট চোখের পানি ফেলে আমার জন্য দোয়া করার যোগ্য না থাকে তাহলে মুসলিম পিতা হিসেবে আমি ব্যর্থ বলে সাব্যস্ত হবো।

আমাকে ছেলেরা বর্তমানে ব্যবহারের জন্য বা খাবার জন্য বিভিন্ন জিনিস দেয়। মৃত্যুর পর তারা আর কী দিতে পারবে? এর জওয়াব হাদীসে পাওয়া যায়। রাসূল (স) বলেছেন, "জীবিতদের পক্ষ থেকে মৃতের জন্য উপহার হলো তাদের জন্য গোনাহ মাফ চাওয়া।" বিভিন্নভাবে মৃতের নিকট সওয়াব পৌঁছাবার চেষ্টা করা হয়। কিন্তু গোনাহ মাফ না হলে এ সওয়াব আসলে কোনো কাজে আসবে না। তাই মৃতের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব হলো তাদের যাবতীয় গোনাহ মাফ করার জন্য দোয়া করতে থাকা এবং কিয়ামত পর্যন্ত কবরের আযাব থেকে হেফাযতের দোয়া চাইতে থাকা।

আমরা সন্তানদের ক্ষণস্থায়ী পার্থিব জীবনের কল্যাণের জন্য সবকিছুই করার চেষ্টা করি। কিন্তু তাদের আখিরাতের অনন্তকালের জীবনে সাফল্যের গুরুত্ব কমই দিয়ে থাকি। এ উদ্দেশ্যে পারিবারিক বৈঠক অত্যন্ত জরুরি। মাঝে মাঝে বৃহত্তর পারিবারিক সমাবেশ করাও প্রয়োজন। এ উদ্দেশ্যেই সেদিন আমাদের ঐ জমায়েতের ব্যবস্থা হয়। ঐ দিন সর্বসম্মতভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় যে, মাঝে মাঝে এ জাতীয় অনুষ্ঠান করা হবে।

মাওলানা কাযী গোলাম কবিরের বংশধর

আমার আব্বা মাওলানা কাযী গোলাম কবিরের ৪ ছেলে ও ৫ মেয়ে। আল্লাহর রহমতে আমরা ৪ ভাই-ই জীবিত। বোনদের মধ্যে একজন বিয়ের বয়সেই মারা গেছে এবং আর একজন ৫ সন্তান রেখে মৃত্যুবরণ করেছে। বাকি তিন বোনের মধ্যে ২ জন ঢাকায় এবং ১ জন মোমেনশাহীতে আছে। আমি সবার বড়। আমার ৬ ছেলে, কোন মেয়ে নেই। আপনার ছেলে-পেলে কয়জন, জিজ্ঞেস করলে বলি আমার সব ছেলে, পেলে নেই। বাংলাদেশে নিযুক্ত প্রথম সৌদি রাষ্ট্রদূত শায়খ ফুয়াদ আবদুল হামিদ আল খতীব মন্তব্য করেছিলেন, You may be father of six sons but as you have no daughet, you are not full father, you are half father.

পূর্ণ-পিতা ও অর্ধ-পিতার পরিভাষা এর আগে শুনিনি। আমার ৬ ছেলে বিয়ে করিয়ে ৬টি মেয়ে যোগাড় করলাম। ৬ ছেলের ৫ জনই ফুল ফাদার এবং একজন ২ মেয়ের পিতা হিসেবে হাফ ফাদার। আল্লাহ আমাকে মেয়ে দেননি বটে, কিন্তু ১২ নাতনী দিয়ে পুষিয়ে দিয়েছেন। ৫ ছেলের ঘরে ৭ নাতি মিলে ২০০২ সাল পর্যন্ত আমি ১৯ জনের দাদা।

আমার দ্বিতীয় ভাই ডা. গোলাম মুয়ায্যামের ২ ছেলে, যার ১ ছেলের ঘরে ৩ নাতি, অন্য ছেলের ঘরে ৩ নাতনী এবং একমাত্র মেয়ের ঘরে ২ নাতি। এরা সবাই এখনও হাফ ফাদার ও মাদার। ভবিষ্যতে কী হবে আল্লাহ জানেন।

আমার তৃতীয় ভাই ইঞ্জিনিয়ার গোলাম মুকাররামের একমাত্র ছেলের ঘরে ২ নাতনী ও ১ নাতি। তার ৩ মেয়ের ঘরে ৩ নাতি ও ২ নাতনী।

আমার চতুর্থ ভাই ইঞ্জিনিয়ার ড. এম মাহদীউয্যামানের ১ ছেলে ও ৪ মেয়ে। ছেলের ঘরে ২ নাতি, বড় মেয়ের ঘরে ১ ছেলে, দ্বিতীয় মেয়ের সম্প্রতি বিয়ে হলো। ছোট ২ মেয়ে অবিবাহিতা।

সাধারণত ছেলে ও মেয়ে, ছেলেদের স্ত্রী ও সন্তান এবং নাতিদের স্ত্রী ও সন্তানকেই বংশধর গণ্য করা হয়। কন্যা ও জামাতাদের সন্তান বংশের অন্তর্ভুক্ত নয়। সে হিসেবে কোলের শিশুসহ আব্বার বংশধরদের সংখ্যা এ পর্যন্ত মোট ৭১ জন। আব্বার ২ কন্যার মৃত্যুর পর জীবিতদের সংখ্যা ৬৯ জন।

২৮ ডিসেম্বরের জমায়েত

ঢাকায় অবস্থানরত ৩ ভাই, ২ বোন, ছোট ভগ্নিপতি মাওলানা কাযী সৈয়দ শরীয়তুল্লাহ, ভাইদের কন্যা ও জামাতা এবং তাদের সন্তানরা, ভাগ্নে ও ভাগ্নির

পরিবার মিলে মোট ৪৭ জন সেদিন সমবেত হয়। আমাদের এক ভগ্নির ছেলে ৭ম শ্রেণীর ছাত্র মুবীনের কুরআন তিলাওয়াতের মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু হয়।

এক ভাতিজীর ছেলে কেজি টু-এর ছাত্র ফাওয়াযও তিলাওয়াত করতে উদ্বুদ্ধ হলো। এক ভাগ্নের কন্যা ১ম শ্রেণীর ছাত্রী মুসতাহসিনা এগিয়ে এসে মাইক হাতে নিয়ে কালেমা তাইয়েবা শুনালো। শুদ্ধ উচ্চারণ শুনে আমরা খুশি হলাম। লক্ষ্য করলাম যে, এ জাতীয় অনুষ্ঠানে যোগদান করলে ছোট বয়সেই অনেক লোকের সামনেও বলার হিম্মত সৃষ্টি হয়।

অনুষ্ঠানটি আমার চেম্বারেই হয়। আমি আমার চেয়ারে বসা এবং পুরুষরা সবাই আমার সামনে বসলো। সাথের দু'কামরায় মহিলাদের বসার ব্যবস্থা হলো। কোনো ঘোষণা ছাড়াই আমার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠান শুরু হলো। অনুষ্ঠানের প্রস্তাবক মেজর আমান আযমীকে এর উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলার দায়িত্ব দিলাম। সে মাঝে মাঝে তার দাদার বংশধরদের সমাবেশের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে বক্তব্য পেশ করলো। সবাইকে এ বিষয়ে মতামত প্রকাশের সুযোগ দিলাম। কয়েকজন এর সমর্থনে বক্তব্য রাখার পর সর্বসম্মতভাবে সিদ্ধান্ত হয়ে গেলো।

এক অঘটন ঘটে গেলো

এ অনুষ্ঠানের জন্য পূর্বে কোনো এজেন্ডা তৈরি করা হয়নি। একসাথে সবার খাওয়ার কথা। মহিলারা নিজ নিজ বাড়ি থেকে বিভিন্ন রকম তৈরি খাবার নিয়ে এলো। পিকনিক খাবার পরিবেশ সৃষ্টি হলো। রাত ৯টা বেজে যাচ্ছে, খাওয়ার পর ছোট ছেলে-মেয়েসহ বাড়ি ফিরতে যাতে বেশি রাত না হয় সে জন্য আমি অল্প কিছু নসীহতমূলক কথা বলার জন্য মাইক চাইলাম।

হঠাৎ ডা. গোলাম মুয়ায্যামের বড় ছেলে সোহায়েল বিশেষ বক্তব্য রাখবে বলে ঘোষণা করা হলো। সবাই ঔৎসুক্যের সাথে তার দিকে তাকালো। সে বলল, "ঘটনাক্রমে আজকের দিনটির এক বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। মহিলাদের পক্ষ থেকে একটি বড় কেক আনা হয়েছে। ৫০টি ছোট ছোট ফুল কেকের উপর সাজানো রয়েছে।" আমাকে লক্ষ্য করে বললো, "বড় চাচার জীবনে পঞ্চাশের আজ এক বিরাট তাৎপর্য রয়েছে। এ বিষয়ে তিনি কোন ধারণা রাখেন কি-না?"

আমি বিস্ময়ের সাথে ও অসহায়ভাবে বললাম, "আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না, এমন কিছুই আমার ধারণায় আসছে না।"

আমার ছোট দু'ভাই মুয়ায্যাম ও মুকাররামের উৎফুল্ল চেহারা দেখে বুঝা গেলো যে, তারাও এ সম্পর্কে অবগত। অন্যরা বিষয়টা জানে বলে মনে হলো না। এ পরিবেশ ও পরিস্থিতিতে সোহায়েল বিজ্ঞের ভঙ্গিতে ৫০-এর তাৎপর্য সম্পর্কে সবাইকে অবগত করলো। সে বললো, "আজ বড় চাচার বিয়ের ৫০তম বর্ষপূর্তি।"

আমি জন্মবার্ষিকী, বিবাহবার্ষিকী জাতীয় অনুষ্ঠান কোনো সময়ই করি না। আমাদের বংশে কেউ কেউ করে। যারা করে তারা আমার মনোভাব জানে বলে জন্মবার্ষিকী

অনুষ্ঠানে আমাকে দাওয়াতও দেয় না। অথচ সেদিন আমার বাড়িতে এসে আমার বিয়ের ৫০তম বার্ষিকী পালন করে ফেললো। তাই এটাকে একটি 'অঘটন' হিসেবেই উল্লেখ করলাম।

পরে জানতে পেরেছি যে, এর মূল ষড়যন্ত্রকারী হলো আমার তৃতীয় ভাইয়ের স্ত্রী। ঘটনাক্রমে তারও বিয়ে হয় ২৮ ডিসেম্বর এবং সে দিন তাদের বিয়ের ৪৩তম বার্ষিকী। আমার তৃতীয় ভাইটিও আমার মতোই বেরসিক। সেও বার্ষিকী জাতীয় অনুষ্ঠান করে না। কিন্তু তার স্ত্রীর পরিকল্পনা সম্পর্কে সে জানতো কি-না বলতে পারি না। ঐ দিন সকাল ১০টায় আমি ও আমার স্ত্রী পত্রিকা পড়ছিলাম। হঠাৎ তিনি আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, "আমাদের বিয়ের আজ পঞ্চাশ বছর হলো।" আমি শুনে মুচকি হাসলাম। তিনিও তার ২য় জা'র ষড়যন্ত্র সম্পর্কে কোন আভাস পেয়েছিলেন কিনা জিজ্ঞেস করিনি। আরও জানতে পারলাম যে, এ সমাবেশের আসল প্রস্তাবক আমার তৃতীয় ভাইয়ের স্ত্রী।

জন্ম, মৃত্যু ও বিবাহবার্ষিকী

যারা গণ্যমান্য ও খ্যাতিসম্পন্ন তাদের জন্ম ও মৃত্যুদিবস পালন করা হয় এবং পত্রিকায় ছবিসহ খবরও প্রকাশিত হয়। তাদের কথা আলাদা। কিন্তু প্রায় সকল সচ্ছল পরিবারেই এসব অনুষ্ঠান হয়ে থাকে। এ সব অনুষ্ঠানে আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবদেরকে দাওয়াত করে আনা হয়।

জন্মদিবসে বিশেষভাবে প্রস্তুত কেক কাটা হয় এবং আমন্ত্রিতদেরকে আপ্যায়ন করা হয়। নিমন্ত্রিতরা উপহারও নিয়ে আসে। এটাকে আমি ধনীদের বিলাসিতা মনে করি। এ সব অনুষ্ঠানে গরীব আত্মীয়দের কোন স্থান নেই। তাদেরকে দাওয়াত দেওয়া হয় না; দিলেও উপহার দিতে অক্ষম বলে অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয় না। সচ্ছল পরিবারের সবার জন্মবার্ষিকীই যদি এভাবে পালন করা হয়, তাহলে কত লোকের কত সময়ের অপচয় হতে পারে তা সহজেই উপলব্ধি করা যায়। অর্থের অপচয়ের উল্লেখ না-ই বা করলাম। অপচয় করার মতো অর্থ যাদের আছে তারাই এসব করে।

আমি কখনো আমার ছেলেদের জন্মবার্ষিকী পালন করিনি। আমার ছেলেরা বিদেশে তাদের সন্তানদের জন্মদিবস পালন করে কি-না জানি না। বড় ছেলে মামুন তা করে না বলে জানি। ছোট ছেলে সালমান আমার সাথে থাকে বলে এতোটুকু জানি যে, ওর ৬ বছর বয়সী বড় মেয়ের জন্মদিনে চাইনিজ রেস্টুরেন্টে যেয়ে খায় এবং বাপ-মায়ের জন্যও খাবার নিয়ে আসে। এটুকু অনাড়ম্বর দিবস পালনে আমি আপত্তি করিনি। আমার নাতনীটি যে ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে পড়ে, সেখানেও শিক্ষিকারা জন্মদিবসের গুরুত্ব দেয় বলে সে নিজেও এ বিষয়ে সচেতন।

ধনী ও মধ্যবিত্ত পরিবারে পিতা ও মাতার মৃত্যুবার্ষিকী পালন করা হয়। এটা আসলে পিতামাতার জন্য দোয়ার অনুষ্ঠান। কিন্তু দোয়া না বলে বলা হয় মিলাদ। রাসূল (স)-এর জন্মদিবসটি মিলাদ নামে খ্যাত। আরবে ১২ই রবিউল আউয়ালকে ঈদে মিলাদুন্নবী বলা হলেও তারা এ নিয়ে কোন অনুষ্ঠান করে না। সৌদি আরব,

কুয়েত, আরব আমিরাত প্রভৃতি দেশে আমাদের দেশের মতো 'মিলাদ শরীফ' বলে কোনো অনুষ্ঠানের অস্তিত্ব নেই।

আমাদের দেশে মিলাদের প্রচলন এতো ব্যাপক যে, নতুন বাড়ি, দোকান, সংগঠন ইত্যাদির উদ্বোধন উপলক্ষে মিলাদ করা হয়। এমনকি সিনেমা হল শুরু উপলক্ষেও মিলাদ হয়। সবচাইতে হাস্যকর ব্যাপার হলো, মৃত্যুদিবস পালনের অনুষ্ঠানকেও মিলাদ বলা হয়। অথচ, মিলাদ শব্দের অর্থ হলো জন্মদিবস।

আমাদের দেশে বিভিন্ন উপলক্ষে সবাই আল্লাহর নিকট দোয়া করার উপর যথেষ্ট গুরুত্বারোপ করে। এটা অবশ্যই প্রশংসনীয় রেওয়াজ। এ উদ্দেশ্যে যে মাহফিল করা হয় তা আসলেই দোয়ার মাহফিল। এটাকে মিলাদ মাহফিল বলা অর্থহীন। কেউ বলতে পারেন যে, এ সব মাহফিলে রাসূল (স)-এর জন্মকালের কথা উল্লেখ করা হয় বলেই মিলাদ নামটা চালু হয়েছে। আজকাল আলেমগণ এসব মাহফিলে কুরআন ও হাদীস থেকে দীনের শিক্ষাই আলোচনা করেন। তাই মিলাদ নাম দেওয়া প্রাসঙ্গিক নয়। বিশেষভাবে মৃত্যুবার্ষিকীতে তো নয়ই।

বিবাহবার্ষিকী পালনও ধনীদের আর এক বিলাসিতা। জীবনের বৃহত্তর ও মহত্তর উদ্দেশ্যে যারা কর্মতৎপর, তাদের এ জাতীয় বিলাসিতার অবকাশ ও অবসর নেই। বিবাহিত জীবনের প্রথম কয়েক বছর এটা দাম্পত্য সম্পর্কে আনন্দের নতুন মাত্রা যোগ করতে পারে; কিন্তু পরিণত বয়সেও এর কোন গুরুত্ব তারাই দিতে পারে, যাদের অবসর জীবনে করার মতো কোন কাজ নেই। এ ছাড়া যদি কোন দম্পতি সত্যিই আনন্দ উপভোগ করেন, তাহলে আমার মতো কাঠখোট্টা লোকের আপত্তিতে তাদের কিছুই আসে যায় না। আমার বক্তব্য হচ্ছে, জীবনটা বড়ই মূল্যবান। এমন কাজেই সময়, শ্রম, অর্থ ও আবেগ নিয়োগ করা উচিত, যা সমাজ ও মানুষের কল্যাণে আসে।

অনুষ্ঠানের উপসংহার

আমাদের অনুষ্ঠানের শেষ পর্যায়ে ৫/৭ মিনিট আমার পক্ষ থেকে উপদেশমূলক বক্তব্য পেশ করার পর আমাদের সবার দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ, পরলোকগত মুরুব্বীদের জন্য মাগফিরাত, দেশের ও বিশ্ব-মুসলিমের উন্নতি ও মঙ্গলের জন্য দোয়া করা হয়।

উপদেশমূলক বক্তব্যের মূল কথা ছিলো, আখিরাতকেন্দ্রিক জীবন-যাপনের গুরুত্ব। "রাব্বানা আতিনা ফিদ্‌দুনইয়া হাসানাতাও ওয়া ফিল আখিরাতে হাসানা" অর্থ হলো দুনিয়ায় এমনভাবে জীবন-যাপনের কামনা, যার ফলে আখিরাতে হাসানা লাভ করা যায়। এর অর্থ এটা নয় যে, দুনিয়ার সব মজা এবং আখিরাতের সব সুখ-সুবিধা। আখিরাতের সাফল্যকে জীবনের টার্গেট হিসেবে গ্রহণ করলে দুনিয়ার জীবনে যা করা প্রয়োজন, তা করার তাওফীক লাভ করাই হলো দুনিয়ার হাসানা। রাসূল (স) বলেছেন, "বুদ্ধিমান ঐ ব্যক্তি, যে আত্মসমালোচনা করে এবং যে কাজই করে এর ফল আখিরাতে কী পাওয়া যাবে সে হিসাব করেই করে।"

৫০.

বেসরকারি কলেজ টিচার্স এসোসিয়েশনের প্রতিষ্ঠা সম্মেলন

১৯৫২ সালের শেষ দিকে কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজের উদ্যোগে 'পূর্ব-পাকিস্তান কলেজ টিচার্স এসোসিয়েশন' গঠনের উদ্দেশ্যে এক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। তখন ঐ কলেজের প্রিন্সিপ্যাল ছিলেন জনাব আখতার হামিদ খান। তিনি ব্রিটিশ আমলে আইসিএস অফিসার ছিলেন। খাকসার আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা আল্লামা এনায়েত উল্লাহ খান মাশরেকীর জামাতা ছিলেন। নওগাঁ কলেজের আরবীর অধ্যাপক ছিলেন আমার শ্বশুর সাহেব। তাঁর কাছে শুনেছি যে, নওগাঁ মহকুমার এসডিও থাকাকালে আখতার হামিদ খান নিয়মিত জামে মসজিদে জামাআতে নামায আদায় করতেন। মসজিদে ধুলাবালি দেখে নিজেই একদিন ঝাড়ু দিলেন। লজ্জিত হয়ে মসজিদের খাদিম তার হাত থেকে ঝাড়ু নিতে চাইলে তিনি দিলেন না। নিজেই ঝাড়ু দেওয়ার কাজ শেষ করলেন। এরপর ঐ মসজিদে আর ধুলাবালি দেখা যায়নি।

কুমিল্লা কোটবাড়িতে BARD (Bangladesh Academy for Rural Development) বা বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী) নামক যে বিখ্যাত প্রতিষ্ঠানটি রয়েছে তা আখতার হামিদ খানেরই কীর্তি। তাঁর সাথে আমার সর্বশেষ দেখা ১৯৭২ সালে ইসলামাবাদ গভর্নমেন্ট হোস্টেলে।

কলেজ টিচার্স এসোসিয়েশন গঠনের উদ্দেশ্যে প্রতিটি কলেজ থেকে দু'জন অধ্যাপক প্রতিনিধিকে যোগদানের দাওয়াত দেওয়া হয়। রংপুর কলেজ টিচারদের প্রতিনিধি হিসেবে আমি ও অধ্যাপক কলীমুদ্দীন আহমদ (দর্শন) কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজে পৌঁছলাম। শীতকালীন ছুটির অবকাশে কলেজ ক্যাম্পাসেই থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা হলো। সে সময়কার ২০টি জেলা শহরের ডিগ্রি কলেজসমূহের প্রতিনিধি ছাড়াও বেশ কতক মহকুমা শহরের কলেজ থেকেও প্রতিনিধি এলেন। তখন কলেজের সংখ্যা খুব বেশি ছিলো না। সর্বমোট কতজন ডেলিগেট সম্মেলনে যোগ দিলেন তা মনে নেই, তবে পঞ্চাশের কম ছিলো না বলেই মনে পড়ে। দু'দিন একসাথে থাকা, খাওয়া, অধিবেশনে আলোচনা ইত্যাদির সুযোগে প্রায় সবার সাথে ব্যক্তিগতভাবে ঘনিষ্ঠ হবার চেষ্টা করি। নতুন লোকের সাথে পরিচয় করা আমার অভ্যাস। এ অভ্যাস আমার আজীবন উপকারে লেগেছে।

অন্তর্মুখী ও বহির্মুখী স্বভাব

সমাজে দু'রকম মানুষ দেখা যায়। কিছু লোক কারো সাথে নিজের উদ্যোগে কথা বলে না। কেউ কথা বলতে চাইলে যত কম কথায় জওয়াব দেওয়া যায়, তা-ই করে। এদেরকে ইংরেজিতে Introvert বলে। এরা মিশুক নয়। আন্দোলন ও সংগঠনের জন্য এ জাতীয় লোক খুব-একটা উপযোগী নয়। কিছু লোক স্বভাবগতভাবেই মিশুক। তাদেরকে Extrovert বা বহির্মুখী বলা হয়। এটা আসলেই স্বভাবজাত অবস্থা।